জাতিসত্তার কষ্টিপাথরে গণতন্ত্র

সৌমেন নাগ

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জুড়ে শোনা যাচ্ছে অসহিষ্ণুতার ধ্বনি, অস্থির পদকম্পন। বিচ্ছিন্নতাবোধের উষ্ণ বাষ্পে তিলে তিলে গড়ে ওঠা ঐক্যের বন্ধনগুলি দ্রুত শিথিল হয়ে একে অপরের প্রতি বন্দুকের নল তাক্ করতে চাইছে। জাতিসত্তার অমীমাংসিত শর্তগুলি যে সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এতদিনকার বিশ্বাসের দুর্গগুলি যে এভাবে একের পর এক মাটির সঙ্গে মিশে যাবে তা তো কিছুদিন আগেও ভাবা যায়নি। কি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গেই না ঘোষণা করা হয়েছিল পুঁথিগত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই জাতিসত্তার সমস্ত প্রশ্নগুলির মীমাংসার সূত্র বলা আছে। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়নের অপমৃত্যুর পর জানা গেল প্রাধান্যের বিরুদ্ধে জাতিগত তথা আঞ্চলিক শক্তিগুলির বিক্ষোভের বাদ কী ভয়াবহ বিস্ফোরণের ক্ষমতা অর্জন করে চলেছিল। ইন্দোনেশিয়াতে আই এস আই বা হিন্দুপরিষদ তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে বলে কোনও পক্ষই দাবী করেনি। তবু ইন্দোনেশিয়াতেও ভাঙ্গনের পদকম্পন। সমাজতন্ত্রী চীনের বেজিং থেকে দক্ষিণে সাংহাই-সবাই একই ভাষায় কথা বলে। তবু কেন চীনের দক্ষিণ ভূখণ্ডে বিচ্ছিন্নতার অশনি সঙ্কেত ?

কীসের গনতন্ত্র কার গনতন্ত্র

উত্তর পূর্ব ভারতের অস্থিরতার উৎস সন্ধানে প্রান্তভূমির এই সব আদিবাসীদের মনের দরজায় টোকা দিতে গিয়ে দেখেছি গণতন্ত্র বলতে এলিট শ্রেণীর ভাবনা ও বিশ্লেষণগুলির সঙ্গে এদের ভাবনাগুলিকে মেলানো যাচ্ছে না। গণতন্ত্র তথা জাতিসত্তা বিকাশের শর্তগুলি নিয়ে এতদিনের বিশ্বাস সোভিয়েতের অকল্পনীয় অপমৃত্যুর পর যেমন ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেছে তেমনি ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বুর্জোয়া গণতন্ত্রেও জাতি সংঘর্ষগুলি অসংখ্য প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নানা সংশয় আজ গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলিকে গ্রাস করে চলেছে।

প্রশ্ন উঠেছে, কীসের গণতন্ত্র? কার গণতন্ত্র ? কোথাও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে (মায়ানমার, পাকিস্তান), কোথাও জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার (শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ), কোথাও স্বাধীন আত্মপ্রকাশ (চীনের তিব্বত)-এর দাবীতে চলছে নানা ভঙ্গির আন্দোলন। প্রশ্ন উঠবে, এই সব আন্দোলনে গণতন্ত্রের ভূমিকাকে কীভাবে দেখা হবে।

৭১-এর বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা কি পাকিস্থানের মানুষের কাছে স্বাধীনতা তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলে চিহিত হবে? আবার কাশ্মীরের রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাস পাকিস্তানের কাছে কাশ্মীরের জনতার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বলে চিহিত হলেও ভারতের কাছে তো তা বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ড বলেই চিহিত হচ্ছে। কী বলা হবে শ্রীলঙ্কায় তামিল টাইগারদের লড়াইকে ? তামিলনাডুর অধিকাংশ তামিল তাদের তামিল ভাইদের এই দাবীকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী মনে করলেও তাকে কি গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলে মেনে নেওয়া যাবে ? গণতন্ত্রে বাদের ভাষায় প্রবেশ যদি বারণ হয় তবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র ভাবনাকে কি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী বলে ধিক্কার জানাতে আমরা রাজী আছি?

স্বাধীন বাংলাদেশ আমাদের চোখে গণতন্ত্রের বিজয় কেতন বলে চিহিত। চাক্মারা কেন তাহলে এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে তাদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সম্প্রদায়ের আধিপত্যকামী ভাবনার প্রতিষ্ঠা বলে মনে করছে? ১৯৭৫ সালে রাঙ্গামাটি পরিদর্শনে চাক্মাদের ‘ভাই’ বলে সম্বোধন করে যখন তাঁদের মূল বাঙালি সংস্কৃতিতে যোগ দিয়ে বাঙালি হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন চাক্মারা একযোগে বঙ্গবন্ধুর সভা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠের মিশে যাওয়াকে যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে মেনে নিতে সংখ্যালঘিষ্ঠরা নারাজ এটি তারই বহিঃপ্রকাশ।

যুগোস্লাভিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়নের খন্ডিতকরণে যাঁরা উল্লসিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে অচল আধুলি বলে প্রমাণ করতে চাইছেন তাঁদের বুঝতে হবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে অন্দরমহলের অবস্থাও কিন্তু ভাল নয়। নেদারল্যান্ড ভেঙে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকরা যথাক্রমে হল্যান্ড ও বেলজিয়াম গঠন করে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মহিমা প্রকাশ করতে চেয়েছিল, অথচ বেলজিয়ামের ফ্লেমিশ ভাষীরা মনে করছে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফ্রেঞ্চ ভাষীদের হাতে তাদের গণতন্ত্র বিপন্ন।

একনায়কতান্ত্রিক সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে অথবা বৈদেশিক ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে দেশিয় শাসকের হাতে শাসনভার তুলে দিলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এই বিশ্বাসের বটিকা যে সবাইকে সেবন করানো যাচ্ছে না, অর্থনৈতিক সাম্যই গণতন্ত্রের একমাত্র শর্ত নয়, তা কিন্তু বার বার প্রমাণিত হয়েছে। তাই পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ কানাডাতেও স্প্যানিশ/ফরাশি ভাষী বনাম ইংরেজি ভাষীর দ্বন্দ্ব এখনও চলছে।

দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ তথা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ভূমি ভারতের পূর্ব প্রান্তভূমির মানুষেরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৫৭ বছর পরেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রচলিত শর্ত ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে ভোটাধিকার পেয়েও তাকে গেন গণতন্ত্রের জয় বলে মানতে চাইছে না তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। আজ তাই শুধু ভোট বাক্স নয়,

ভাষা, সংস্কৃতি ও গোষ্ঠী ইতিহাস একই মর্যাদায় জায়গা পাচ্ছে কিনা তার উপরও নির্ভর করছে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। ভাবতে হবে পাকিস্তানের সংহতির নামে সমগ্র প াকিস্তানে উর্দু ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা কেন মেনে নিতে পারল না ? যে প্রশ্ন বাঙালি জনজীবনে সত্য, একইসত্য তো ত্রিপুরার কগ্‌বরক লিপি নিয়েও। একই কথা বলা চলে কামতাপুর আন্দোলনে কামতাপুরী ভাষা বা গোর্খল্যান্ডআন্দোলনে গোর্খালি ভাষা প্রসঙ্গে।

পূর্বভারতের এই অস্থিরতার উৎস সন্ধানে বেরিয়ে তাই এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে গণতন্ত্রের ভূমিকা নিয়ে একটা বিতর্ক হওয়া দরকার। বিশেষ করে এই লেখক বাস করেন এই অস্থির উৎসস্থলের একেবারে কেন্দ্রমুখে। ফলে এদের মনের ঘরগুলিকে একেবারে ভিতর থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। তাই চাইছি এই অস্থিরতা যাতে আগামী দিনে ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতের মতোআমাদের অস্তিত্বকে ত্রুদ্ধ অভিমানের লাভাস্রোতে ভস্মীভূত না করতে পারে তার জন্য বিদগ্ধ মহলকে পূর্ব ধ ারণার সঙ্গে বর্তমান বাস্তব অবস্থার সামঞ্জস্য বিধানে তাদের খোলামনের ভাবনাগুলিকে জানতে চাই। যে প্রশ্ন এতদিন করতে অভ্যস্ত ছিলাম, 'এরা কোথা থেকে এসেছে', তার পরিবর্তে 'এরা এখন কোথায় গেল' এবং 'কেন গেল' সেই জিজ্ঞাসাটাকেই মীমাংসা করার তাগিদ অনুভব করছি। কারণ, যে আদিবাসী সমাজকে 'য াদুঘর'- এর দর্শনীয় বস্তু করে রাখার মধ্যে আমাদের উদারতা মনে করেছি তারা এখন পাল্টা প্রশ্ন তুলছে, 'তোমরা কে ?', 'তোমরা কবে এবং কোথা থেকে এসে অ ামাদের দেশ ও সমাজকে দখল করে আধিপত্যবাদের দাপটে আমাদের গণতন্ত্রকে গলা টিপে ধরেছ?'

জাতিসত্তা ও গণতন্ত্র

ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে জনজাতি জীবনের অস্থিরতার উৎসমুখকে না খুঁজে তাকে সামরিক শক্তিতে মীমাংসা করতেচাওয়া যে ভুল ছিল আজ তা বুঝতে পেরে জঙ্গি সংগঠনগুলির সঙ্গে চুক্তিস্বাক্ষরের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা চলছে। এটা যদি সেই প্রথমেই ভাবা যেত তবে এক জঙ্গি দলকে আলোচনার টেবিলে টেনে অ ানলে অপর জঙ্গি দল সেই জায়গায় আবার নতুন করে আত্মপ্রকাশ করত না।

পঞ্চাশের দশকে অস্থিরতা শু হয়েছিল নাগাল্যান্ডও মণিপুরে। যাটের দশকে তা প্রসারিত হয় মিজোরামে। সত্তরের দশকে তা ত্রিপুরায় ছড়ালেও আসামে এই ভাবন া সংত্রামিত হয়েছিল ৮০-র দশকে। এই দশকেরই মাঝামাঝি সময়ে উত্তরবঙ্গের গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন এই বিক্ষোভের মিছিলে যোগ দেগ। সমতলের কামত াপুরকে কেএলও জঙ্গিদলের ভাষায় রূপ দিতে রাজবংশীরা কিন্তু আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করেছিল।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বাণীপ্রসন্ন মিশ্র তাঁর এক অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। শিলং-এর এক খাসিট্যাক্সি ড্রাইভার ডঃ মিশ্রকে অবাঙালি ভেবে গা ড়ি চালাতে চালাতে বলেছিল, 'বাঙালি খুব বদমাশ জাতি সাহেব।'ডঃ মিশ্র ঢোক গিলে জিগেশ করেছিলেন, 'কেন?' খাসি ট্যাক্সি ড্রাইভারের উত্তর, 'বাঙালি নিজেরা এক থাকতে পারল না, হিন্দু ও মুসলমান এই সাম্প্রদায়িক ভাবনায় নিজেরা নিজেদের প্রদেশটাকে ভাগ করে নিল, ওরা এখন আমাদের এক থাকার উপদেশ দিচ্ছে।' একজন অশিক্ষিত খাসি ট্যাক্সি ড্রাইভারের চোখে বাঙালির এতদিনকার কৃষ্টি, অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তির পোশাকটি যে এমন উলঙ্গ অবস্থায় ধরা আছে তা কিন্তু জানা ছিল না, অথবা বলা যায় জানার কোনও তাগিদ ছিল না।

পূর্ব বাংলার নোয়াখালিতে, কলকাতায় হিন্দু - মুসলমানের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা হয়েছিল। সে সময়ে বিহারের মুজাফফরপুরেও হয়েছিল একই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ব াঙালিরা নিজেদের দেশ ভাগ করে প্রমাণ করেছিল বাঙালি বলতে সে শুধু বাঙালি নয়, সে হিন্দু বাঙালি ও মুসলমান বাঙালি এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনে বিভক্ত। এমন কি যারা বামপন্থী বা কমিউনিস্ট, সেই বাঙালিও বলতে পারল না আমি সুধু বাঙালি, হিন্দুও নই মুসলমানও নই। কি নিদাণ পরিণতি কমিউনিস্টদেরও। তাঁরা কোনও ধর্ম মানেন না বলে ঘোষণা করেন অথচ ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারত ভাগ হল 'হিন্দু কমিউনিস্টরা' পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান রাজত্বে থাকবেন না (মণি সিং, খোকা রায়-এর মতো কয়েকজন ছাড়া) বলে হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের 'হিন্দু রাজত্ব' থেকেও অনেক মুসলমান কমিউনিস্ট পূর্ব পা কিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। পাকুড়ের দিঘি থানার দারোগা মহেশ দত্তের সামনে সিধু যেমন বলেছিলেন,'এ আমার দেশ', কানু যেমন বলেছিলেন, 'আমি কানু, এ অ ামার দেশ', তেমনি ১৯৪৭ সালের ২৯শে জুন বাংলার বিধানসভায় যখন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির প্রতিনিধি সভা ও অবশিষ্ট অংশের প্রতিনিধি সভায় ভে াট নেওয়া হল কমিউনিস্টরাও কিন্তু বলতে পারেননি আমরা হিন্দু নই মুসলমানও নই আমরা কমিউনিস্ট, এ আমাদের দেশ। কমিউনিস্ট সদস্যরাও হিন্দু ও মুসলম ান এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনে উভয় সভাতেই বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। কলকাতায় হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা থামতে ছুটে আসতে হয়েছিল এক বৃদ্ধ গুজরাতিকে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই অশান্ত জাতিসত্তার প্রশ্নে বাঙালির ভূমিকা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন কী? তাই এই প্রসঙ্গের সমর্থনে একটা কৈফিয়ত দেওয়া অত্যন্ত জরি। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা থেকে মেঘালয় ও অসমে জাতিসত্তার প্রশ্নে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে তার সূচনা কিন্তু আগত বাঙালি জনস্রোতের চ াপে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেলার আতঙ্ক থেকে শু হয়েছিল. এই প্রতিবেদককে ত্রিপুরার এক প্রত্যন্ত গ্রামে ত্রিপুরার জঙ্গি গোষ্টীর কট্টর এক সমর্থক বলেছিল, 'গণতন্ত্র তো তোমাদের। কারণ তোমরা এখন ত্রিপুরায় ৭১ শতাংশ। তোমাদের কাছে তাই সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র আমাদের হারিয়ে যাবার ব্যবস্থা মাত্র। তোমাদের কলকাতা ত্রমশ অবাঙালি প্রধান হয়ে যাচ্ছে এই আক্ষেপ শুনি অথচ আমরা যে বাঙালি জনস্রোতের চাপে প্রায় ২০ শতাংশে নেমে এসেছি সেই যন্ত্রণাকে বুঝতে চাও না।'

একই কথা শুনেছিলাম মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডেও। জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হয়েছিল, 'তোমরা এত ভারত বিদ্বেষী কেন?' ওরা একই সুরে জবাব দিয়েছিল, 'আমর া ভারত বিদ্বেষী নই। ত্রিপুরা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চলে আর কোনও ত্রিপুরা হতে দিতে চাই না।'

ত্রিপুরার কথা অসমের কথা

ত্রিপুরার অ-উপজাতি জনজাতির বসতি শু হয়েছিল তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। প্রথমটি ঘটেছিল ১৮৩০ সালের আগে। এই সময় ত্রিপুরার শাসকেরা হিন্দুদের ত্রিপুরায় বসবাসের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ১৮৩০-১৯৪৭-র সময়ের মধ্যে স্থায়ী চাষের জন্য জমির সন্ধানে যে সমস্ত অ-উপজাতি এখানে বসবাসের জন্য এসেছিল তাদের অধিকাংশইছিল বাঙালি মুসলমান। ১৯৪৭ অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিপুল পরিমাণে হিন্দু উদ্বাস্তুর স্রোতে উপজাতিরা ভেসে গিয়েছিল। ত্রিপুরার ভূমিপুত্ররা কীভাবে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে হারিয়ে ফেলে নিচেরতালিকা থেকেই তা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়

শ্রেণী ১৯৭৪-৭৫ ১৯০১ ১৯৩১ ১৯৬১
উপজাতি ৪২৩৪৫ ৯১৫৪৪ ১৯০০৩২ ৩৬০০৭০
অ-উপজাতি ৩১৮৯৭ ৮১৭৮১ ১৯২৪১৮ ৭৮১৯৩৫

উপরের এই তালিকা থেকেই দেখা যায় ৬০ বছরের মধ্যেই উপজাতিরা ত্রিপুরায় আগত অ-উপজাতির সংখ্যার কাছে কেমন তলিয়ে গেছে। মনে রাখা দরকার, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এই ২৪ বছরের মধ্যে ত্রিপুরাতে ৬,০৯,৯৯৮ জন পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তু (সরকারি হিসেবে) পরিবারকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। এই বাঙালি পরিবারগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগাভাগিতে ভিটে মাটি হারিয়ে উদ্বাস্তুর পরিচয়ে নয়া ইহুদি রূপে এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। ত্রিপুরার ভূমিপুত্ররা এই আগত জনস্রোতের চাপে নিজেদের হারিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াতে চাইল তাকে শুধু বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে এড়ানো মুশকিল। ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনেও তো প্রায় একই ভাবনা কাজ করেছে।

অসমের অস্থিরতার পেছনেও আছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবার আতঙ্ক। ১৯১১ সালের জনগণনার ফল প্রকাশের পর এই আশঙ্কা আরও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এই দশ বছরে অসমের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ৫৩.২৬ শতাংশ। এর মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ৪১.৮৯ শতাংশ আর মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ৭৭.৪২ শতাংশ। মুসলমান জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির প্রশ্নটি তোলার মধ্যে যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান তাঁরা সামাজিক ও জাতিগত সমস্যার প্রশ্নটিকে বুঝতে চাননি। ১৯৯১ সালে রাজ্যের আদমসুমারি দপ্তরের অনুমান, ১৯৭১-৯১-এর মধ্যে এই রাজ্যে কম করেও ১০ লক্ষ বাংলাদেশি উদ্বাস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ১৯৯৮ সালের ১০ই আগস্টএর India Today পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যকে উল্লেখ করে অসমের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিকে পাঠানো বার্তায় বলেছেন, অসমে ৪০ লক্ষ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বাস করছে। এই অনুপ্রবেশ রোধ না করতে পারলে এরা অসমিয়া জনসংখ্যাকে গ্রাস করে আগামী দিনে উত্তরপূর্ব ভারতকে মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। ঐতিহাসিক এইচ কে বারপুজারীও ‘The Assam Tribune’ (২৫ জুন ১৯৯৯) পত্রিকায় একই আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন যদি অবিলম্বে এই অনুপ্রবেশ রোধ না করা যায় তবে অসমের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে পড়বে। ১৯৯৪ সালের ৭ই জানুয়ারি ঢাকার ‘Holiday’ পত্রিকায় মহিউদ্দিন আহমেদ তাঁর ‘The Missing Population’ প্রতিবেদনে বলেছেন, ‘১৯৭৪-৮১ সালে বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে যাওয়া হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১.২২ মিলিয়ন। আর ১৯৮১ - ৯১ সালে ১.৭৩ হিন্দু বাঙালি হারিয়ে গেছে বাংলাদেশ থেকে।’ আহমদ জনগণনার সূত্র ধরে আরও জানিয়েছেন, ‘একই সময়ে ৩৩,০০০ চাক্‌মা চট্টগ্রাম এলাকা থেকে হারিয়ে গেছে।’

বাংলাদেশের জনবিস্ফোরণ ভয়াবহ সীমায় পোঁছে গেছে। ১৯৯১ সালেই জনসংখ্যা দিবসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীজানিয়েছিলেন বাংলাদেশের পরিবেশ ব্যবস্থায় ১৩ কোটি মানুষের বেশি ধারণ করার ক্ষমতা নেই। ২০০২ সালেই জনসংখ্যা ১৫ কোটি ছুঁয়ে ফেলেছে। এখন শুধু হিন্দু বাঙালি নয়, বাঙালি মুসলমানদেরও সীমান্ত পার করে দিয়ে জনবিস্ফোরণের চাপকে কমাতে হচ্ছে। বাংলাদেশের এই ক্রমবর্ধমান মুসলমানেরা যাতে অবাধে ভারতে প্রবেশ করতে পারে তার জন্য বাংলাদেশে একটি মহল থেকে ‘লেবেনস্রাউম’ তত্ত্ব অর্থাৎ বসবাসের দাবি তুলে বাংলাদেশিদের জন্য বৃহত্তর বাসভূমির প্রয়োজন নিয়ে লেখালেখি শু হয়ে গেছে।

ভাষা ও গণতন্ত্র

উত্তরপূর্বাঞ্চলের অস্থিরতায় ভূমিপুত্ররা (উপজাতি শব্দটি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করিনি) যে তাদের স্বাধীনতা রক্ষার কথাটি বলতে চাইছে সেখানেও আছে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে টিকিয়ে রাখার আকুতি। উত্তরবঙ্গের কামতাপুর দাবি নিয়ে যে আন্দোলন তাকে চোখ রাঙিয়ে নয়, তার অভিমানের ভাষাগুলি পড়ার আগ্রহ ও উদারতা নিয়ে বিষয়টিকে ভাবতে হবে। স্বাধীনতার ৫৫ বছর বাদে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ গঠন করতে হল কেন ? এতে কি স্বীকার করে নেওয়া হল না যে পশ্চিমবাংলার উত্তরভাগে উন্নতি হয়নি।

আজ গঙ্গার এপারের স্বঘোষিত জ্যাঠামশাইরা বলছেন রাজবংশী ভাষা বাংলার উপভাষা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ নির্মল কুমার দাশ তো ‘পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙ্ঘের’ জলপাইগুড়ি শাখার প্রকাশনায় ‘কামতাপুরী ভাষা আন্দোলন ঐতিহাসিক বাস্তবতা’ নামক পুস্তিকায় কামতাপুরীকে বাংলা উপভাষারও মর্যাদাদিতে রাজী হয়নি। তিনি বলেছেন, ‘রাজবংশী শুধ বিভাষারই নাম হতে পারে, ভাষার তো নয়-ই, উপভাষারও নয়।’ ডঃ দাশের প্রজ্ঞা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আলোচ্য প্রতিবেদনটিও ভাষা ও উপভাষা বা বিভাষা নিয়ে নয়। আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গণতন্ত্র ও জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠায় এই অঞ্চলের অস্থিরতা। তবু ভাষা প্রসঙ্গটি অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। ভাষা একটা জাতিকে যেমন পরিচয় দেয় তেমনি ভাষা যে হয়ে ওঠে গণতন্ত্র তথা স্বাধীনতার প্রেরণা তার উদাহরণ তো বাংলাদেশ। জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ভাষার জন্মও হতে পারে। নব কলেবরে সৃষ্টি হতে পারে হারিয়েযাওয়া ভাষার লিপি, সাহিত্য ও লোকশিল্প । উদাহরণ, কুর্মালি, সাঁওতালি এবং গোর্খালি ভাষা। কুর্মালি ভাষা ভারতের প্রাচীন ভাষার অন্যতম হলেও এটি ছিল এতদিন কথ্য ভাষা। ঝাড়খন্ড আন্দোলনের জোয়ারে এই ভাষা যেমন সাহিত্যের ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তেমনি সৃষ্টি হয়েছে তার ব্যাকরণ। সাঁওতালি ভাষার লিপি অলচিকি জনপ্রিয় হয়েছে ঝাড়খন্ড আন্দোলনের ফলেই। দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের নেপালী ভাষীরা যে নেপালী ‘খুসকুরা’ ভাষার নতুন নামকরণ গোর্খালি করার দাবি তুলেছে তার পেছনেও আছে ভারতের নেপালীদের এদেশে নেপালী ভাষীদেরথেকে নিজেদের পৃথক করে আত্মপ্রকাশ করার প্রয়াস।

ভাষা বা উপভ াষার দ্বন্দ্ব তো অর্থহীন। এককালের উপভাষা বলে কথিত ভাষা পৃথিবীর প্রধান ভাষার মর্যাদায় যে রূপান্তরিত হতে পারে তার উদাহরণ তো স্বয়ং ইংরেজি। তা ছাড়া কোনটা ভাষা আর কোনটা উপভাষা ভাষা বিজ্ঞাননীরা তো তার কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দিতে পারেননি। তবু রাজধানীর বুদ্ধিবিলাসীরা প্রান্তভূমির অধিবাসীদেরঅভিমানের ঠিকানাগুলি খোঁজার পরিবর্তে তাঁদের কর্তৃত্ববাদী ভাবনাকে চাপিয়ে দিয়ে অভিভাবকের ভূমিকাকেই প্রতিষ্ঠা করতে চান বলেই প্রান্তভূমির আহত অভিমান বিক্ষোভে রূপান্তরিত হওয়ার প্ররোচনা পেয়েছে। অন্য ভাষাকেবাংলার উপভাষা দাবি করা তো এই প্রথম নয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ওড়িয়া ভাষাকে বাংলার উপভাষা প্রমাণ করতে তাঁর ‘ভাষা বিচ্ছেদ’ প্রবন্ধে ওড়িয়া ভাষায় সেই হরিণের গল্পটি উল্লেখ করেছিলেন। বিশ্বকবিও তো অসমীয়া ভাষাকে বাংলারই উপভাষা মনে করেছিলেন। বিশ্বকবির সেই কথা তো আমরা সবাই পড়েছি, ‘যে ভাষা ভ্রাতাদের মধ্যে অবাধ ভাবপ্রবাহ সঞ্চারের জন্য হওয়া উচিত, তাহাকেই প্রদেশিক অভিমান ও বৈদেশিক উত্তেজনায় পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর স্বরূপে দৃঢ় ও উচ্চ করিয়া তুলিবার যে চেষ্টা তাহাকে স্বদেশ হিতৈষিতার লক্ষণ বলা যায় না এবং তাহা সর্বতোভাবে অশুভকর।’

ওড়িয়া ভাষাকে কি বাংলার উপভাষা বলার সাহস আছে ? অসমীয়া ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেরও একই ধারণা ছিল। ডঃ নির্মল দাশ অহোম-রাজ চুকাম্ফাকে লেখা কামতাপুরের মহারাজা নরনারায়ণের চিঠিটি (১৯৫৫ খ্রিঃ) উল্লেখ করে এটি যে বাংলারই উপভাষা তা তার অকাট্য প্রমাণ বলে উপস্থিত করতে চাইছেন। ডঃ দাশ অহোম রাজারজবাবী চিঠিটি কেন প্রকাশ করলেন না সেটা বোঝা গেল না। সেই চিঠির ভাষা ও গঠন তো অস্বীকার করা যায় না।তাই কামতা নরেশ নরনারায়ণের চিঠিটা যদি বাংলার উপভাষা হয় তবে অহোম রাজার জবাবী চিঠিটিও বাংলার উপভাষা রূপে অসমীয়া ভাষাকে দাবী করা চলে। সেই দাবী যে এখন ওঠেনি তার অন্যতম প্রধান কারণ অসমীয়া ও ওড়িয়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা ।

পৃথক কামতাপুরের দাবী একেবারেই নতুন একথা ভাবার কারণ নেই। ১৯৪০ সালেই উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবি করেছিল।। মঙ্গোলীয় জাতির তিববতীয় বর্মী গোষ্ঠীর এই জনস্রোতকে হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ্যবাদ সহজে প্রবেশাধিকার দেয়নি। ইন্দোচীন জনগোষ্ঠীর কাছারি, গারো, রাভা, লালুঙ, কোঁচ, মেচ জনজাতিকেযেমন হিন্দু ব্রাহ্মণদের ধর্মগু রূপে মেনে নিতে হয়েছিল তেমনি গো-মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করে তাদের হিন্দু সমাজে সমাজে প্রবেশের ছাড়পত্র পেতে হয়েছিল। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা রাজবংশীদের বাঙালি বলেই তো মানতে চাননি। তাই আজ যদি দাবি করা হয় রাজবংশীদের ভাষা বাংলারই উপভাষা তাদের অভিমান প্রতিবাদী হয়ে উঠতেই পরে। সেদিন রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষেরা মুখ খোলেনি, কারণ সে সময় রাজবংশীদের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীদানা বেঁধে ওঠেনি। আজ রাজবংশী সমাজের শক্তিশালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে নগেন্দ্রনাথ বসুর ‘ঋিকোষ’অজানা নয়। তারা দেখেছে এই ‘ঋিকোষ’ রাজবংশীদের ‘বর্বর’ ও ‘স্লেচ্ছ’ বলে বর্ণনা করেছে। তারা তো আজ পড়ছে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গ দর্শন’। সেখানে সাহিত্য সম্রাট ঘোষণা করেছেন, ‘রাজবংশীরা হিন্দু বাঙালির পরিচয় থেকে ভিন্ন।’

আজকের বাঙালি বুদ্ধিজীবী যাঁরা কলকাতায় বসে বাংলার অভিভাবকের আসন দখল করে আছেন তাঁরা রাজবংশীতথা কামতাপুর সাহিত্যকে বাংলার উপভাষা বললেও এই সাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যের অংশ বলে কিন্তু স্বীকৃতি দেননি। প্রমাণবাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কামতা সাহিত্যের কোনও খোঁজ রাজবংশী ছাত্ররা স্কুলের পাঠ্য বইতেপায় না। জানতে হলে তাদের পড়তে হয় আসাম বঞ্জী। কেন এমন হবে?

বাঙালি কুলপতি কান্তি চন্দ্র ভট্টাচার্য, রাজেন্দ্র লাল মিত্ররা এক সময় ওড়িয়া ভাষাকে বাংলার উপভাষা বলে প্রমাণ করতে মাঠে নেমেছিলেন। ভট্টাচার্য-মিত্র মহাশয়ের দাবি যদি কাগজে কলমে সত্যি বলে প্রমাণিত হত তবে হয়ত বাংলাভাষার জ্যাঠামশাইরা কর্তৃত্ববাদীর রথে চড়ে তৃপ্তি পেতেন। তাতে কি বাংলা বা ওড়িয়া ভাষা খুব একটা লাভবান হত? বরং গৌরীশংকর রায়, ফকিরমোহন সেনাপতি সেদিন ওড়িয়া ভাষাকে উপভাষার পরিচয়মুক্ত করতে এগিয়ে এসে যে ভুল করেননি তা কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে।

প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীর সর্বগ্রাসী চেহারা

প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয়, উত্তরবাংলার জনজাতি চরিত্র যেমন ছিল দক্ষিণবঙ্গ থেকে পৃথক তেমনি এখানকাররাজনৈতিক ইতিহাসও ছিল গাঙ্গেয় পশ্চিমবাংলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মনে রাখা দরকার, কোচবিহার বাংলার সঙ্গে যুক্ত হবার সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মত ছিল না। একটি অংশ যেমন ১৩০৭ বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট এই ক্ষুদ্র কোচবিহার রাজ্যটিকে পৃথক রাজ্য রূপে রাখতে চেয়েছিল। আরেকটি অংশ চেয়েছিল পাকিস্তানের সঙ্গে দিতে। অসমের সঙ্গে যুক্ত হবার দাবিতে অপর একটি অংশ এত শক্তিশালী ছিল যে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহকে পর্যন্ত কলকাতার জনসভায় ঘোষণা করতে হয়েছিল যে কোচবিহারকে অসম না পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হবে তা নির্ধারিত হবে গণভোটের মাধ্যমে।

দীর্ঘ বাদ-প্রতিবাদের পরর ১৯৪৯ সাতলের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত জানালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায় ৫ই ডিসেম্বর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলন, ‘......আমি এই সঙ্গে তোমাকে এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই, তোমরা শেষ পর্যন্ত ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করতে রাজী হয়েছ বলে। যার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সে শুধু এই প্রদেশের পরিবৃদ্ধিই নয়, এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক সংঘটনও বটে।’

এই মনস্তাত্ত্বিক প্রটা সবচেয়ে গুত্বপূণ হলেও পশ্চিমবাংলার অভিভাবকেরা আগত এই ভিন্ন পরিবেশের মানুষদের পরিবারের সদস্য করে নিতে তাদের মনস্তত্ত্বকে মোটেই আমল দিতে চাননি। পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগামী জাতি পশ্চাৎপদ জাতিগুলির উপর প্রভুত্ব করার মানসিকতা নিয়ে কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করেছে এই ধারণা যাতে নবাগত জেলাটির ভূমিপুত্রদের মধ্যে বাসা বাঁধতে না পারে তা দেখার দায়িত্ব ছিল এই রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার। সেই দায়িত্ব কী ভাবে পালন করা হয়েছে তার একটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে।

শিলিগুড়ি শহরের অভিজাত পাড়া হাকিম পাড়া এখানকার জমির দাম এখন কাঠা প্রতি ৪ লক্ষ টাকা। স্থানীয় রাজবংশী শরৎ বর্মন এখানে একটা স্কুল স্থাপন করতে প্রায় ১ বিঘার মতো জমি দান করেছিলেন। শর্ত ছিল স্কুলটি তারপিতার নামে ‘দর্পনারায়ণ স্কুল’ হবে। এই শর্ত মেনেই ‘দর্পনারায়ণ স্কুল’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কিছু দিন পরে রাতারাতি শরৎবাবুকে না জানিয়েই দর্পনারায়ণ নাম পরিবর্তন করে স্কুলটি হয়ে গেল ‘বিবেকানন্দ স্কুল’। এই শহরেই আছে আরেকটি স্কুল -- এর নাম ছিল তরাই স্কুল। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্কুলটির একটি ভবন নির্মাণের জন্যঅর্থ সাহায্য করার বিনিময়ে স্কুলটির নাম হয়েছে ‘তরাই তারাপদ স্কুল’। একই কারণে আরেকটি স্কুলের নাম হয়েছে ‘জ্যোৎস্নাময়ী স্কুল’। এই দুটি স্কুলের নামকরণ কিন্তু কোনও মহাপুষের নামে করার কথা ওঠেনি। রাজবংশীদের আহত অভিমান যদি ভাবতে শু করে তারা এখনই সংখ্যালঘিষ্ঠ বলেই তাদের নামগুলি মুছে দেবার চেষ্টা হচ্ছে তবে তাদের সেই আহত ক্ষতে কী ভাবে প্রলেপ দেওয়া যাবে? কারণ, কেউ তো ‘তরাই তারাপদ’ বা ‘জ্যোৎস্নাময়ী স্কুল’ - এর নামটি পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারে না।

স্বাধীনতা তথা গণতন্ত্রের ভাবনা শুধু আজ তাই একটা নিজস্ব ভূখণ্ডকে বোঝায় না। স্বাধীনতা বলতে আজ বৃহত্তর ও প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীর সর্বগ্রাসী সাংস্কৃতিক অভিযানের বিদ্ধে প্রতিরোধকেও বোঝায়।

দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের জাতি বিন্যাসের মৌলিক পার্থক্যকেও বুঝতে হবে। দেশ ভাগের যন্ত্রণাকে বুকে নিয়ে যে বাঙালির জনস্রোত সেদিন এই বঙ্গে আছড়ে

পড়েছিল তাদের সঙ্গে দক্ষিণপাড়ের বাসিন্দাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্র অমিল ছিল না। তবু ঘটি-বাঙাল দ্বন্দ্ব মিটতে সময় নিয়েছিল। এপারের ভূমিপুত্রদের ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল আগত উদ্বাস্তুদের থেকে পৃথক। এপারের ভূমিপুত্ররা দেখতে পেল আগত জনস্রোতে তাদের ভাষা ও পরিচয়গুলি দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে।

১৮৯০ সালের জনগণনায় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় কোনও বর্ণ হিন্দু বাঙালির নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। ১৯৩০ সালের রাজস্ব রিপোর্টে দেখা যায়, শিলিগুড়ি, শহরের বর্তমানের দেশবন্ধু পাড়ার নাম ছিল রাজ রাজেশ্বরী জোত, হাকিম পাড়ার নাম ছিল ব্রজসিং জোত, ভারত নগরের নাম ছিল যোকান জোত, মহানন্দা পাড়ার নাম ছিল সবুর জোত। আজ সারা শহরের কোথাও রাজবংশীদের কোনও নামের চিহ্ নেই। এমন কি যে শিলিগুড়ি কলেজ দানবীর বীরেন রায় সরকারের দানে বিশাল জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে সেখানে রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষটির একটি নামফলকও কলেজের কোথাও নেই।

স্বাধীনতার পর কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ও দার্জিলিং -এর সমভূমিতে মূলত রংপুর, মৈমনসিংহ,পাবনা, দিনাজপুর, ঢাকা জেলা থেকে য়ে উদ্বাস্তুর জনস্রোত এখানে সমবেত হয়েছিল, তারা এসেছিল উন্নত আর্থিক ও উন্নত সংস্কৃতিকে বহন করে। ফলে, রাজবংশীরা এই উন্নত জনস্রোতের মাঝে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং জীবন ও জীবিকার একমাত্র উপকরণ জমিগুলি হারিয়ে ফেলেছিল। এই প্রসঙ্গে এই প্রতিবেদকের একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।

ঘটনাটি আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগের। এই প্রতিবেদক এক শীতের সকালে খুব ভোরে বাড়ি থেকে হিলকার্ট রোডে যাবে। পথেই কলেজ পাড়া। সকালের কুয়াশায় একটি বড় বাড়ির গেটের বাইরে একটি রিক্সা দেখে এগিয়ে গিয়ে দেখল এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা রাজবংশী দম্পতি সেই বড় বাড়ির গেটের সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রণাম করছেন। প্রতিবেদককে দেখে তাঁরা যে খুব ভয় পেয়েছিলেন এতে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁদের সঙ্গী এক রিক্সাচালক তণ রাজবংশী। নাম বলেছিল সন্তু রায়। সে জানিয়েছিল আজ যে জমিতে এই বিশাল বাড়ি সেই জমিটা ছিল তাঁদের। এখানেই ছিল তাঁদের বসতবাড়ি। এই জমিটি আজকের মালিককে (ঘোষবাবু) ৫০ টাকা কাঠা দরে তাঁর দাদু বিক্রি করেছিল। দাদু-দিদিমার বিশ্বাস এখানে তাঁদের ইষ্ট দেবতা এখনও বাস করেন প্রথম প্রথম ঘোষবাবু তাঁর দাদু দিদিমাকে বছরের এই দিনটিতে পুজো করতে ভিতরে আসতে দিতেন। এখন দেন না বলে খুব ভোরলোয় সকলে ঘুমিয়ে থাকে তখন তার দাদু-দিদিমা বাইরে থেকে মোম জ্বালিয়ে পুজো করে চলে যান।

কলেজ পাড়ায় জমির দাম কাঠা প্রতি কয়েক লক্ষ টাকা। সন্তু তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে রিক্সা চালাতে গিয়ে এখনও যদি ক্ষয়রোগে মারা না গিয়ে থাকে তবে সে নিশ্চয়ই আজকের কলেজ পাড়া যে তারই ছিল সে কথা তার পরিবারের তণ সদস্যদের কাছে বলে। সন্তুরা এখান থেকে উঠে গিয়েছিল রাঙ্গাপানীর মহানন্দা পাড়ের এক জায়গায়। মহানন্দা প্রকল্পের জন্য তাদের সেখান থেকেও উচ্ছেদ হতে হয়েছে। আজ দিনমজুর সন্তুর বংশধরেরা যখন তার কলেজ পাড়ায় ‘বাবুদের’ বাড়ির মজুরের কাজ করে তখন তার বুক ঠেলে যে নিশ্বাস বেরিয়ে আসে সেখানেই জমে থাকে সব হারাবার হাহাকার এবং অবিশ্বাস।

সব হারিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়েও রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী । এ যে উনবিংশ শতাব্দীর সেই বাঙালি নবজাগরণ। পৃথিবীর ইতিহাসেরও তো একই গতি। মধ্যবিত্ত এই শ্রেণী শুধু ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখে না, তার জনজাতির অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেও সবার সঙ্গে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে চায়। উপপত্নীর মতো ‘উপ’ শব্দটি তার ভাষা ও জাতিগত পরিচয়ের আগে চূড়ান্ত অসম্মানজনক বলে মনে হয়। তাই তারা আজ প্র তুলেছে, কে জাতি আর কে উপজাতি এই বিভাজনের অধিকার কে কোথা থেকে পেল ? বাঙালি জাতি আর নাগারা উপজাতি এই পরিচয়লিপির যুক্তি নিয়ে উঠেছে গভীর প্র। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভাবনা ও ইউরোপীয় নৃতত্ত্ববিদদের রচনাকে অনুসরন করে নিজেদের জাতি ও অপরকে উপজাতি বলার মধ্যে যে দ্বিতীয় জনের উপর প্রথম জনের একটা অবজ্ঞার মনোভাব প্রকাশ পায় তা উপজাতি বলে কথিত জনজাতির এই দ্রুত সংগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী মানতে রাজী নয়। যেমন ইংরেজদের সেই ‘নেটিভ’ কথাটি ভারতীয় সমাজের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তেমনি ‘উপজাতি’ কথাটি একই ধরনের অবজ্ঞাসূচক শব্দ বলে চিহ্নিত হচ্ছে। বিশেষ করে ট্রাইব বা উপজাতির এমন কোনও সংজ্ঞা তো নেই যা এই দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশের সঙ্গে মিলে যায়। অপরদিকে এই উপজাতি শব্দটির মধ্যে প্রকাশ পায় কেমন একটা নিকৃষ্টতার পরিচয় --- এরা আদিম, বিচ্ছিন্ন, অনুন্নত ও সংকীর্ণ গন্ডির ও সংকীর্ণ গন্ডির ধর্মমতে বিশ্বাসী অর্থাৎ সভ্য আধুনিক মানুষের বিপরীতে এক অসভ্য আদিম মানুষ।

আজ যে ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চল সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জুড়ে স্বাধীনতা তথা গণতন্ত্রের লড়াই শু হয়েছে তা শুধু রাজনৈতিক লড়াই একথা ভাবা ভুল। এই লড়াইয়ের পেছনে আছে সামাজিক মর্যাদা তথা ‘উপ’ পরিচয়ের অসম্মানকে দূরে সরিয়ে জাতিসত্তার স্বাধীন পরিচয়কে প্রতিষ্ঠার অদম্য বাসনা। আর এই ভাবনাই তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক সীমা দাবি করতে প্রেরণা দেয়। ভারত নামক সংহতি স্থাপনে যখন ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল তখনই তো সংহতির কবর রচনা করা হয়েছিল। ১৮টি ভাষা প্রধান ভাষার মর্যাদা পাবে, তাদের ভাষাভিত্তিক রাজ্য হবে (উর্দু-সংস্কৃতি ইত্যাদি বাদে) আর বাকি ভাষীরা তাদের প্রজা হবে একথা আজ অনেকে মানতে চাইছে না।

সংহতির অর্থ জোড়াতালি দিয়ে একটা দেশের মানচিত্র গঠন নয়, সংহতির অর্থ সমমর্যাদার অধিকার পাশাপাশি অবস্থান। তবু যদি আমরা দুনিয়া জোড়া পরিবর্তনের হাওয়াকে উপেক্ষা করে সেই পোকায় খাওয়া জীর্ণ জাতীয়তাবাদের কাঠামোকে আঁকড়ে রাখতে চাই তবে জাতীয় সংহতির মৃত্যুর জন্য দায়ী আমরাই। যেমন আজ সবাই সোভিয়েতের মৃত্যুর জন্য দায়ী করছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের শী কর্ণধারদের।

--

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com